মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের পটভূমি ও বিষয়বস্তু

ভূমিকা :

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে মুনীর চৌধুরী (২৭ নভেম্বর ১৯২৫, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১) এক অবিস্মরণীয় নাম। অসাধারণ প্রতিভাধর এ নাট্যকার মৌলিক ও অনুবাদ নাটক দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। মুনীর চৌধুরী ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে অনেক নাটক ও একাঙ্কিকা লিখেছেন; তার মধ্যে 'কবর' অন্যতম। তার রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি প্রভৃতি নাটক সবিশেষ সাফল্য লাভ করলেও জনমানুষের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রশংসা পেয়েছে 'কবর' নাটকটি। বিষয় - ভাবনা এবং পরিবেশন - শৈলীর কারণেই সম্ভবত এটির প্রচার ও প্রসার অসামান্য। 'কবর' গভীর জীবনবোধের আলোকে সজ্জিত একাঙ্ক নাটক। এ ধরনের নাটক অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সৃষ্টি। যেখানে সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে দেখে নেয়া যায় জীবনের রূপ - নিবিড়তা ও গন্ধ - গভীরতা। এখানে পাওয়া যায় সমকালের সহজ অনুভবের শিল্পঋদ্ধ জীবন নিষ্ঠ কথা।

পটভূমি :

'কবর' ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি নাটকটি রচিত হয়; তখন তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দী জানা যায়, আরেক রাজবন্দী রণেশ দাশগুপ্ত মুনীর চৌধুরীর কাছে চিঠি লিখেছিলেন জেলখানায় মঞ্চস্থ করা যায় এমন একটি নাটক লিখে দেয়ার জন্য। যেখানে দেশপ্রেম থাকবে, আলো - আঁধারি পরিবেশ থাকবে এবং নারী চরিত্র এমন ভাবে থাকবে যাতে পুরুষ অভিনয় করতে পারে। মুনীর চৌধুরী রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধ মাথায় রেখেই 'কবর' নাটিকাটি রচনা করেছিলেন। তিনি তার স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'জেলখানাতে নাটক রচনার অসুবিধা অবশ্যই ছিল। এ অসুবিধাটুকু সামনে ছিল বলেই তো 'কবর' নাটকটির আঙ্গিকে নতুনত্ব আনতে হয়েছে। আট - দশটি হারিকেন দিয়ে সাজাতে হবে সে কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই 'কবর' নাটকটিতে আলো - আঁধারি রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। ' নাটকটি সর্বপ্রথম ১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি জেলখানাতে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

বিষয়বস্তু :

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যেই নাটকটি জেলখানায় সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়। ভাষা আন্দোলনে বহু মানুষ শহীদ হলেও অল্প ক'জনের পরিচয় আমরা জানতে পেরেছিলাম; কত শত লাশ গুম করা হয়েছিল, তার প্রকৃত হিসাব আজও জানা যায়নি। লাশ গুমের এই ঘৃণ্য রাজনীতিকে উপজীব্য করেই নাটকটির পুরো গল্প এগিয়ে গেছে। নাটকটির সমগ্র ঘটনাস্থল ছিল গোরস্থান, ভাষা শহীদদের লাশ গুম করার নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য একজন অসৎ নেতা তার দলবল নিয়ে সেখানে এসেছিলেন। নেতার এই নীলনকশা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ছিলেন ইন্সপেক্টর হাফিজ। নাটকের শুরু থেকেই অসৎ নেতাকে মদ্যপানে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়, সুযোগ পেয়ে লোভী হাফিজও নেতার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শেষ চিহ্নটুকু ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নানা ধরনের পরিকল্পনা করতে থাকেন তারা।

সবকিছু যখন পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছিল, তখুনি মুর্দা ফকির নামক এক চরিত্রের আগমন ঘটে, আধপাগল এই মানুষটি যেন সমাজের বিবেক হিসেবে আবির্ভূত হন। লাশগুলো এখনো জীবিত আর তাদের কবর থেকে উঠিয়ে তিনি মিছিল করবেন– এমন অদ্ভুত একটি কথা বলে তাদের ভড়কে দেন মুর্দা ফকির। এরপর কিছু অস্বাভাবিক ঘটনার আবর্তনে এগিয়ে গেছে সম্পূর্ণ গল্প।

একটি নাটক সার্থক করার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান থাকে নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের। চরিত্রগুলো যত শক্তিশালী হবে, নাটকের বুনিয়াদ তত মজবুত হবে। 'কবর' নাটকটিও তার ব্যতিক্রম ছিল না, তিনটি কেন্দ্রীয় চরিত্র পুরোটা সময় দারুণভাবে নাটকটির গল্প টেনে নিয়ে গেছে।

নেতা:

একজন আগাগোড়া অসৎ মানুষ, ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে ভাষা আন্দোলনের মতো মহান এক ঘটনাকে 'সামান্য গণ্ডগোল' হিসেবে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন। তার ভাষ্যমতে, ভাষা শহীদেরা ছিলেন অবাধ্য দুষ্টু ছেলে, অবাধ্যতার শাস্তি হিসেবে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ চলেছিল! পুরোটা সময় জুড়ে মদ্যপানে ব্যস্ত থাকাটা তার চারিত্রিক দোষের দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে। তাছাড়া সমাজের অন্যান্য অসৎ নেতাকর্মীর নানা আচরণ 'কবর' নাটকের নেতার মাঝেও ফুটে উঠেছিল। বুকে সাহস না থাকলেও সবধরনের পরিস্থিতিতে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়ার প্রবণতা ছিল নেতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মানুষ হিসেবে তাকে বেশ হঠকারী মনে হয়েছে, সবধরনের পরিস্থিতিতে শুধু গুলি চালানোর কথা বলাটা মোটেও বিচক্ষণতার প্রমাণ দেয়নি। তবে নাটকের একদম শেষদিকে মুর্দা ফকিরকে কিছুদিনের জন্য তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার কথাটা অবশ্য তার দূরদর্শী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। বাংলার যেসব অসৎ নেতার কর্মকাণ্ডের জন্য পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর শোষণের জালে আমরা বন্দী ছিলাম, তাদেরই একজন প্রতিনিধি হিসেবে নেতা চরিত্রটি দারুণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

হাফিজ:

হাফিজ ছিলেন একজন চাটুকার পুলিশ কর্মকর্তা, নাটকের সিংহভাগ সময় জুড়ে তাকে নেতার চামচামি করতে দেখা গেছে। আদর্শ বিবর্জিত এই মানুষটি নিজের সুবিধার জন্য যেকোনো কিছু করতে তৈরি ছিলেন। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত, নানা কঠিন পরিস্থিতিতে নেতা হঠকারী আচরণ করলেও হাফিজকে পুরো নাটকেই দূরদর্শী হিসেবে দেখা গেছে।

বিশেষ করে মুর্দা ফকিরের আগমনের পর যে আধিভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, তা দেখে পর্যুদস্ত না হয়ে হাফিজ যেভাবে সবকিছু সামলানোর চেষ্টা করে গেছেন, সেটা তার চারিত্রিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। তবে তার সকল বুদ্ধি অপাত্রে কাজে লাগায় দিনশেষে মানুষ হিসেবে একজন মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ হিসেবেই তিনি বিবেচিত হবেন।

মুর্দা ফকির:

পুরো নাটকটিকে অন্য উচ্চতায় নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন মুর্দা ফকির। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে নিজের চোখের সামনে সমস্ত আপনজনকে মারা যেতে দেখেছেন, মানুষগুলোকে কবর দেওয়ার সামর্থ্যও তার ছিল না। সেই থেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গোরস্থানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান তিনি, নাম হয় মুর্দা ফকির। আচমকা 'ঝুঁটা' বলার মাধ্যমে দৃশ্যপটে তার নাটকীয় আগমন ঘটে।

আগমনের পর থেকেই নানা ধরনের কথা বলতে থাকেন তিনি, যা আপাতদৃষ্টিতে পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হবে। কিন্তু একটু ভাবলে তার প্রতিটি সংলাপের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। তার মতে, মাটিচাপা দেওয়া লাশগুলোর দেহে এখনো প্রাণ আছে, হাফিজ আর নেতাকেই তিনি মৃত বলে অভিহিত করেন। এই কথার মধ্য দিয়েই নাটকটির সারসত্য প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা শহীদদের তো মৃত্যু হয়নি, ইতিহাসের পাতায় তারা সর্বদা উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের আশায় যারা সেদিন নিজেদের বিবেক বিসর্জন দিয়েছিল, মৃত্যু আসলে তাদেরই হয়েছিল। তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েতে।

সমালোচনা :

১৯৩৬ সালে রচিত মার্কিন নাট্যকার আর উইন শ'র 'বেরি দ্য ডেড' এর প্রভাব রয়েছে 'কবর' নাটকে। নাট্যকার মুনীর চৌধুরী নিজেও তা স্বীকার করেছেন। কবরে যেতে অস্বীকার করার ব্যাপারে দুই নাটকের মাঝেই মিল রয়েছে, তবে তা কেবলমাত্র ভাবগত ঐক্যের মিল। মুনীর চৌধুরী তার নিজস্ব স্বকীয়তায় নাটকটির বুনিয়াদ যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন, তা এক কথায় অসাধারণ। তাছাড়া 'বেরি দ্য ডেড' নাটকে মৃত সৈনিকদের বিদ্রোহকে সত্য বলে তুলে ধরে কিছুটা আধিভৌতিক ঘটনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটা প্রতিবাদী ভাব তুলে ধরে হয়েছিল।

কিন্তু 'কবর' নাটকে নেতা ও হাফিজের মাতাল অবস্থায় অপ্রকৃতিস্থ দেখানো হয়, ফলে শহীদদের কবরে যেতে অস্বীকার করার দৃশ্যটির যৌক্তিক কারণ হিসেবে নেতা ও হাফিজের বিভ্রমকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই মিল থাকার প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যকার মমতাজ উদদীন আহমদ বলেন,

এই সামান্য ভারসাম্যটির জন্য 'কবর'কে অনুসারী নাটক বলা যাবে না। এমন হলে পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটককে কাহিনী ভাগের জন্য অনুকৃতির দায় বহন করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ওই সময়ে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর দিকে সরাসরি আঙুল তুলে এমন একটি নাটক লেখাটা সত্যিই অনবদ্য নিদর্শন। এটি ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম প্রতিবাদী নাটক। সাহসী ভঙ্গিতে এভাবে প্রতিবাদ করতে পারতেন বলেই মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ঠিক আগমুহূর্তে মুনীর চৌধুরীকে তার বাবার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, 'কবর' নাটকে চমকপ্রদ রহস্যজাল, কৌতুকাবহ যেমন আছে তেমনি আওছ এর অন্তর্মুখী বিষাদময় ঘটনা। এই কৌতুক আবহ থেকেই বিকশিত হয়েছে বিষাদাত্মক ঘটনা। রাজনৈতিক সচেতন মুনীর চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করে নাটক রচনা করলেও তা সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে বাঙালীর অস্তিত্বের সংগ্রামে পরিণত করছেন; আর এখানেই তার কৃতিত্ব।

সংকলন ও সম্পাদনা :

হাসান মেহেদী, *প্রভাষক, বাংলা বিভাগ*